বিভূতিভূষণের সাহিত্যধারায় অশনি-সংকেত

বিভূতি রচনাবলীর (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দশম খণ্ড) গ্রন্থ-পরিচয় অংশে স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—" 'অশনি-সংকেত' বিভূতি সাহিত্যধারায় একটি ব্যতিক্রম বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে ঠিক ব্যতিক্রম বলা চলে না।" আলোচকের এই মন্তব্যের প্রথমাংশ থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই ব্যতিক্রম কী ধরনের ব্যতিক্রম? তাহলে বিভূতিভূষণের সামগ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্যই বা কী কী?

বিভূতিসাহিত্যের আলোচনাসূত্রে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন—'প্রকৃতিবর্ণনা, শৈশব-চিত্র ও বাস্তবতার স্তর বাহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ—এই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাবপরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করিয়াছে।' সমালোচকের এই মন্তব্য বিভূতিভূষণের সব উপন্যাস সম্বন্ধে হয়তো সর্বতোভাবে সত্য নয়, কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী, অপরাজিত', শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' এবং মাঝের 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান' প্রভৃতি প্রধান প্রধান উপন্যাস সম্বন্ধে এ মত স্বীকার করে নিতে কোন বাধা নেই। প্রকৃতি, শৈশব-জীবন এবং আধ্যাত্মিকতা বিভূতিসাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই উপাদানগুলি হয়তো তাঁর সব উপন্যাসে সমানভাবে নেই, কিন্তু কম বেশি প্রায় উপন্যাসেই আছে। এমনকি তাঁর বহু গল্প এবং দিনলিপিগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। যেখানে শিশু নেই, সেখানে শৈশবস্মৃতির অনুধ্যান আছে; না হলে আছে করুণ-মধুর অতীত স্মৃতির রোমন্থন (Nostalgia)। তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' থেকে শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' এই ভাব ও উপাদানে অনেকাংশে বিন্যস্ত।

বিভূতিভূষণ মূলত রোমান্সধর্মী লেখক। পরিবর্তমান প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কবিত্ব ও দার্শনিকতার সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের গৃহাশ্রয়ী মনকে এই ধূলিমলিন জগতের পরপারে যুগযুগান্তরব্যাপী এক অতীন্দ্রিয় মহাজীবনের জন্য স্বপ্নালু করে তোলে; আমাদের ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টির সামনে অবারিত হয় এক রহস্যময় অধ্যাত্মলোকের দ্বার। অপু এই কল্পলোকের চিরপথিক, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর জিতু দ্বারবাসিনীর পথে পথে এই দেশেরই স্বপ্ন দেখে, মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণ অসীম নক্ষত্রলোকের নীরব সঙ্গীত শোনে, 'দেবযান'-এর পুষ্প অবিনাশী আত্মায় শত সহস্র গতিপথে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ-মর্ত্যের মোহনায় এসে উপলব্ধি করে, বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি 'তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন।... বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে

যে! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত—ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।' আর 'ইছামতী'র ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচপোতা বাঁওড়ের ধারে এসে অনুভব করেন—'তিনি আছেন, তাই এই মা আছে, ছেলে আছে, ফুল আছে, স্নেহ আছে, আত্মত্যাগ আছে, সেবা আছে, প্রেমিকা আছে, প্রেমিক আছে।' আসলে বিভূতিভূষণ কবি, মনীষী; তিনি অধ্যাত্মবাদী কিন্তু মানবপ্রেমিক। তাঁর দৃষ্টি ভূমার দিকে প্রসারিত, কিন্তু ভূমিকে উপেক্ষা করে না।

তাই প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার পাশে পাশে মর্ত্যপৃথিবীর হতভাগ্য দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনালেখ্যও তিনি সমান আন্তরিকতার সঙ্গে রচনা করেন। হরিহর রায়ের হতদরিদ্র পরিবারটির দুঃখে আমরা ব্যথাতুর হই, আরণ্যকের কুন্তা, মঞ্চী, ধাতুরিয়া, ছানিয়া, সুরতিয়ার দুঃখে আমাদের দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ হয়। অধ্যাত্মচেতনার চরম সৃষ্টি যে 'দেবযান', তাতে যতীনের বিদেহী আত্মাও পুনর্জন্মের সম্ভাবনায় কল্পনা করে—'পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেরুবে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে নুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতছে লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।'...

যতীনের এই ইচ্ছা তো ধনীর দুলাল হয়ে জন্মাবার ইচ্ছা নয়; সে খেটে-খাওয়া মানুষের সন্তান হতে চেয়েছে; চেয়েছে বাৎসল্য এবং প্রেমের দ্বারা রচিত একটি ক্ষুদ্র সংসার।

আসলে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রসস্রষ্টা হিসেবে রোমান্টিক হলেও তিনি বাস্তবের তৃণমূল স্তরের জনজীবনের বিশ্বস্ত কথাকার। তাদের অবজ্ঞাত অখ্যাত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। এক মুঠো ভাতের জন্য কাতরতা, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার অনমনীয় মনোভাব তিনি জন্মাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। উত্তর-জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অতীতকে তিনি ভোলেননি। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসাই তাঁকে ভুলতে দেয়নি। তাই উপন্যাস শুধু নয়, অজস্র গল্প লিখেছেন তিনি এই সব সাধারণ দরিদ্র মানুষদের নিয়ে। তিনি 'মেঘমল্লার' 'স্বপ্ন-বাসুদেব', 'উড়ুম্বর' প্রভৃতি গল্প যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন 'হিঙের কচুরি', 'তালনবমী', 'রূপো বাঙাল' প্রভৃতি গল্প।

আমাদের আলোচ্য 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসটি মানবদরদী বিভূতিভূষণের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একশ্রেণীর লোভী মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর গ্রাম বাংলাকে যে কীভাবে গ্রাস করেছিল, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন মানুষ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ'য়ে শ'য়ে লাখে লাখে মৃত্যুকবলিত হতে চলেছিল তারই ভয়ঙ্কর চিত্র বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মতি-মুচিনীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু-দৃশ্য এ কাহিনীতে অঙ্কিত হয়নি; কিন্তু সর্বনাশা মন্বন্তর যে বজ্রের রূপ ধরে এগিয়ে আসছে, সে যে বহু প্রাণ ভস্মীভূত করবে তা ঐ একটি মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই সংকেতিত হয়েছে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস তাই বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক দলিল।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এ উপন্যাসকে পাঠকের ব্যতিক্রম বলে মনে হয় কেন? বিভূতিপ্রতিভার একি কোন আকস্মিক বা স্বতন্ত্র অবদান? পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর কি কোন সাদৃশ্য নেই?

আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর আলোচনার পূর্বে শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রারম্ভিক মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশটুকু স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে ঠিক ব্যতিক্রম বলা চলে না। এই মন্তব্যের সমর্থনে শচীন্দ্রনাথ বলেছেন, যিনি 'ফকির', 'বারিক অপেরা পার্টি', 'সিঁদুরচরণ' প্রভৃতি গল্প লিখেছেন, তাঁর হাতে 'অশনি-সংকেত'-এর কাহিনী সহজেই ধরা পড়বে। অবশ্য 'অশনি-সংকেত'-এর সঙ্গে উক্ত গল্পগুলির সাদৃশ্য এই যে বিভূতিভূষণ এখানে সমাজের নগণ্য, বিত্তহীন, আভিজাত্যহীন অর্থাৎ সর্বহারা মানুষের লেখক। কিন্তু এই মানুষগুলি সম্পদে দীন হলেও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে তথাকথিত অনেক ধনী মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। এদের প্রেমের বিশ্বস্ততা, সততা এবং শিল্পানুরাগ এদের চরিত্রকে মহত্ত্ব দান করেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের পটভূমি এগুলির পশ্চাতে নেই। এ প্রসঙ্গে 'বরো বাগদিনী' গল্পটি স্মরণীয়। বরো বাগদিনী কাপড়ের অভাবে লেখকের নিকট একটি রেশন কার্ডের জন্য বারবার আবেদন করেছে। তার স্বহস্তে বাঘ মারার বীরত্বের গৌরব তার বস্ত্রহীনতার দৈন্যের দ্বারা যেন ম্লান হয়ে গেছে। 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের অগ্রবর্তী উপন্যাস 'অনুবর্তন'-এ বিভূতিভূষণ যুদ্ধের সময়ে জাপানী বোমার আতঙ্কে কলকাতাবাসীদের কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার কথা বলেছেন। তবে সে উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য যুদ্ধ বা মন্বন্তর নয়, একটি স্কুলের ইতিকথা।

'অশনি-সংকেত'-এর কিছুটা সমধর্মী বিবরণ আমরা পাব ১৩৫০ সালে 'নূতন পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি অসম্পূর্ণ রচনা ''বহরাগড়া' ভ্রমণকাহিনীতে। বহরাগড়া সিংভূম জেলার একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান, কিন্তু সেখানেও অন্নাভাব দেখা দিয়েছে। বিভূতিভূষণ বলছেন—'যেখানেই গিয়েচি সেখানেই অন্নকষ্ট ও ধানচাল সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েচে।' বহড়াগড়া স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন কতকগুলি কঙ্কালসার ছেলেমেয়ে। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, এদের বাপ মা মজুর শ্রেণীর। এরা স্কুলের আশ্রিত। রান্নাঘরের নর্দমা দিয়ে যে ভাতের ফ্যান পড়ে, পাতের ভাতটাত যা থাকে বা ফেলে দেওয়া হয়—তাই খায়। আবার রাত্রেও তাই।

সেখানেই পথচলতি মানুষের কাছে বিভূতিভূষণ শুনলেন মেদিনীপুর জেলার অবস্থা। পথের ধারে মানুষ নির্জীব অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানেই তিনি শুনলেন, রাণাঘাট টাউনে তেরো হাজার লোকের বাস কিন্তু চার দিন হল সেখানে পয়সা দিলেও একদানা চাল জুটছে না। তিনি স্বীকার করেছেন, সে সময় তিনি বিহারেই বেশি থাকতেন বলে বাংলার অবস্থা ঠিকমত জানতেন না। কাজেই বাস্তববিমুখ তিনি ছিলেন না। মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তাই রুশতী সেন সঙ্গতভাবেই বলেছেন, 'বহরাগড়া পড়তে পড়তে অস্বীকার করা যায় না যে, সেই ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের ভার বিভূতিভূষণও তাঁর নিজের ধরনে বহন করছিলেন।'

এইসব বিচার করে দেখা যায় 'অশনি সংকেত' বিভূতি সাহিত্যধারায় একেবারে স্বতন্ত্র বা ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতির বর্ণনা এ উপন্যাসেও মাঝে মাঝে আছে। তবে সে প্রকৃতিকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে বিকৃত করেছে, ধ্বংস করেছে। অনঙ্গ-র পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবার স্বপ্নের মধ্যে রোমান্টিক নস্ট্যালজিয়াও কিছু আছে। দেবতাজ্ঞানে অতিথি-সেবার মধ্যে ভক্তিভাবও আছে। তবে এগুলি এ উপন্যাসে গৌণ, মানুষই মুখ্য। তাদের অনশন-ক্লিষ্ট জীবনযন্ত্রণাকেই জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণ বড় স্থান দিয়েছেন এখানে। আর এই

যন্ত্রণাকে তিনি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন। তাই এ লেখা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

তা ছাড়া অচ্ছুত বলে কাউকে ঘৃণা করা অন্যায়। শ্রেণী চেতনার জগদ্দল পাথরটাকে অনঙ্গবৌ সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মতি-মুচিনীর মৃত্যুর শ্মশানে উচ্চনীচ, ধনীনির্ধন সব এক হয়ে গেছে। 'মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।' রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী যেন সত্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া গঙ্গাচরণ একটি মহৎ সত্য কথা বলেছে—'জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।' অর্থাৎ জাত্যাভিমান মুছে ফেলে সকলে মিলে কৃষির উন্নতিসাধন না করলে দেশের মুক্তি নেই, শ্রীবৃদ্ধি নেই। অনঙ্গ-র সঞ্চিত শস্যবীজ দিয়েই আগামী দিনের সোনার ফসল বোনা হবে—আসবে নবান্নের উৎসব। অশনি-সংকেত-এর সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মুক্তির পথও বিভূতিভূষণ নির্দেশ করেছেন।

তথাকথিত ভদ্রলোকদের দোষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই তিরস্কার, আত্মপ্রত্যয়-নিষ্ঠ মতবাদের এমন ওজস্বিতা, মানবিক আবেদনপূর্ণ এমন সকরুণ দুঃখচিত্র বিভূতিভূষণের আর কোন রচনায় আছে বলে জানা নেই। তাই 'অশনি-সংকেত' উপন্যাস বিভূতি সাহিত্যধারার অনেকটা অনুসারী হয়েও কিছুটা ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।